ভূ-রাজনীতির গোলকধাঁধায় পাকিস্তানের হাত থেকে কাশ্মীরের মুক্তি

প্রতিম রঞ্জন বসু

১

আধুনিক শহরে গণ্যমান্যদের মেলামেশার জন্যে নানা জায়গা থাকে। শহরের চেহারা অনুযায়ী গণ্যমান্যদের চরিত্র ও পছন্দ বদলায়। রাজধানী দিল্লিতে সারা পৃথিবীর কূটনীতিকের ভিড়। তাছাড়া পররাষ্ট্র বিষয়ক নানা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ লোকজনও আছে। এদের আড্ডা মারার একটা পছন্দের জায়গা হল ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশানাল সেন্টার বা আই-আই-সি। তুলনামূলক ভাবে সস্তায়, ভালো খাবার পাওয়া যায়, ফলে আড্ডাটা জমেও ভালো।

বছর তিনেকের বেশি আগে এখানেই এক নামকরা প্রাক্তন কূটনীতিকের সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ভদ্রলোক প্রায় তিন দশক আগে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন। এখন বই লেখা, গবেষণা এসব নিয়ে আছেন। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে গেছেন। দেখেছেন সেখানে উন্নয়নের ছোঁয়াও নেই। আঞ্চলিক রাজনীতি নিয়ে ওনার মতামত বিশেষ গুরুত্ব পায়। যা বলেছিলেন তার সারকথা হল, ভারতের পররাষ্ট্রনীতি বহুদিন নেহরুর দেখানো পথেই চলেছে। এর বৈশিষ্ট্য হল— বড় বড় কথা বলা, যার বাস্তবে কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। ভূ-রাজনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের কোলে ঝোল টেনে আনার চেষ্টা ছিল না, ফলে আঞ্চলিক রাজনীতিতে ভারতের প্রভাব ছিল না। ইন্টারভিউ শেষ হবার পর প্রশ্ন করেছিলাম ভারতে এত বড়মাপের কূটনীতিক থাকতেও, বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তান কি করে ভারতকে বার বার প্যাঁচে ফেলে? উদ্দেশ্য ছিল, কাশ্মীর নিয়ে খোঁচানো। হো হো করে হেসে বলেছিলেন, ওরা সর্বক্ষণ ওই নিয়েই পড়ে থাকে।

দুটোকে মেলালে ব্যাপারটা হাসির থাকে না অবশ্য। ভারত ভেঙে পাকিস্তান হবার ইতিহাস সবার জানা। কিন্তু যেটাকে জ্ঞানীগুণী লোকেরা ধামাচাপা দিয়ে রাখেন সেটা হল পাকিস্তান হল সেই কুপুত্র যে শুধু পরিবার ভাঙে তাই নয়, গোটা পরিবারটাকে পথে বসানোই তার ধ্যানজ্ঞান। এর মূল, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি।

ইসলাম ধর্মের লোক সংখ্যায় বেশি এমন দেশ পৃথিবীতে আরো আছে, যেমন ইন্দোনেশিয়া। সেখানে প্রাচীন ভারতের প্রভাব আজও দৃশ্যমান। ইন্দোনেশিয়ার ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব যথেষ্ট। কিন্তু পাকিস্তান যেন ভারতের ইতিহাস ভূগোল সব গুলিয়ে দেওয়ার জন্যে জন্মেছে। এর একটা কারণ আছে সেই ইকবাল, স্যার সৈয়দ লতিফ ইত্যাদিদের তৈরি ভারত ভাগের মুখবন্ধে, যেখানে বলা হয়েছিল জাতিগত ভাবে উপমহাদেশের মুসলমান আরব ও বাকি ইসলামী দুনিয়ার নিকটতম এবং হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

পাগলের প্রলাপ মনে হলেও এটা কিন্তু খুব সুক্ষ্ম রাজনীতি যা দিয়ে ভবিষ্যৎ তৈরি হবে। উদ্দেশ্য দুটো। প্রথম ঃ পাকিস্তান ও বাংলাদেশের স্কুলপাঠ্য বই দেখুন, ইতিহাসের শুরুই ইসলামিক শাসনে। মাঝে ইংরেজ, ভারত ইত্যাদির দুঃশাসনের পরে এখন সুশাসন। এ বই পড়ে যারা বড় হবে তারা কিভাবে ভাববে বিবেচনা যোগ্য। দ্বিতীয় ঃ ভারতের কিছু মুসলমানের মনে (যেমন কাশ্মীরে) দ্বিধা তৈরি করা যাতে পাকিস্তান তৈরির জিগির বন্ধ না হয়। কজন আর জানবে যে যেসব মুসলমান দেশভাগের সময়ে পাকিস্তানে গেছিলেন তাদের আজও কি দুরবস্থা। এই দুটো কাজে পাকিস্তানের গুরু ছিল মূলত সৌদি আরব।

উপমহাদেশ ও সৌদি দু-জায়গাতেই সুন্নি মুসলমানরা সংখ্যাগুরু। ১৯৩৮ সালে সৌদিতে তেল আবিষ্কারের আগে, সেখানকার মানুষ মরুভূমিতে বেদুইনের জীবন কাটাত আর অনেকে ভারত সহ নানা দেশে ছোটখাট কাজ করত। তেল পাওয়াতে সৌদি হঠাৎ বড়লোক হল। রিয়াধ শহরকে আমেরিকার হিউস্টনের মতো বানানো হল। কিন্তু তাতে মন ভরল না। বড়লোকের ইচ্ছে হল, সে মুসলমান দুনিয়ার মোড়ল হবে। বললেই তো আর মোড়ল হওয়া যায় না। আরবে ইরান, ইরাক আছে। তাদের বহুদিনের সভ্যতা। ইরানে ৯৫% মানুষ শিয়া মুসলমান যাদের সঙ্গে সুন্নিদের সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়। ইরাকে সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায় এসে (১৯৭৯) সংখ্যাগুরু শিয়াদের ওপর অত্যাচার করলেও, ধর্মকে তোল্লাই দিতে চায়নি। তাছাড়া সে নিজেই এক মোড়ল ছিল। ওমান তো আবার ভারতের বন্ধু। এদিকে পাকিস্তান চায় ভারতকে টপকে, উপমহাদেশের মোড়ল হতে। সুতরাং একে-একে দুই।

আসলে ব্যাপারগুলো আরেকটু জটিল। ভারত স্বাধীন হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরপরই। তখন পৃথিবী জুড়ে 'কোল্ড-ওয়ার' দানা পাকাচ্ছে। পূর্ব-

ইউরোপ চলে গেছে সোভিয়েত রাশিয়ার দখলে। আর সোভিয়েত রাশিয়ার সীমানা তখন মধ্যপ্রাচ্য অর্থাৎ এখন যাকে পশ্চিম এশিয়া বলা হয় তার গায়ে। ইরাক, টার্কি এরা ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিবেশী। দু-পক্ষই এই অঞ্চলে নিজের আধিপত্য চায় —কেউ তেলের কুয়োর ইজারা নিচ্ছে তো আর কেউ অস্ত্র বেচছে, বিপ্লবে উৎসাহ দিচ্ছে।

১৯৭৯ সাল নাগাদ এই অঞ্চলে তিনটে বড় ঘটনা ঘটল। আমেরিকার বন্ধু শা-রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ইরানে আয়াতোল্লা খোমেইনি ক্ষমতায় এলেন। আমেরিকার সঙ্গে তখন থেকেই ইরানের কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। ইরাকে ক্ষমতা নিল সাদ্দাম। আর ওদিকে আফগানিস্তানে সত্তরের দশক জুড়ে অস্থিরতার পর, সোভিয়েত সেনা ঢুকে পড়েছে। তাকে তাড়াবার জন্যে আমেরিকা মুজাহিদিনদের সমর্থন দিচ্ছে। এই গোটা ঘটনাক্রমে সবথেকে বেশি লাভ হয় পাকিস্তানের। ইরান আর সৌদি দুজনেই নিজেদের স্বার্থে পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়ে গেছে। ইরানের বন্ধু চাই, বিশেষত ইসলামী দুনিয়ায়। আর সৌদির মাতব্বরি চাই। ওদিকে আমেরিকা একদিকে সৌদিকে তোল্লাই দিচ্ছে, অন্যদিকে পাকিস্তানকে। পাকিস্তান থেকেই তো আফগানিস্তানে মুজাহিদিনদের জন্যে 'সাহায্য' যাবে!

পাকিস্তানের সেনা আর সামরিক শাসকরা এর পুরো ফয়দা তুলেছে ভারতের বিরুদ্ধে জিগির বজায় রাখতে। আশির দশক থেকে একটানা কাশ্মীরে অশান্তির শুরু যা ফুলে ফেঁপে ওঠে নব্বইয়ের দশকে আর তাতে এখনও পর্যন্ত ৪২,০০০ মানুষ মারা গেছেন। তাছাড়া সারা দেশজুড়ে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম, ২০০৮ সালে মুম্বাই আতঙ্ক— এসব তো আর বলার দরকার পড়ে না। ফয়দা তুলেছে সৌদি, সারা পৃথিবীতে তাদের মনের মতো, উগ্র ইসলাম মতবাদ ছড়িয়ে। ইসলামী সন্ত্রাসবাদ বলে আজ আমরা যা দেখি, তার শুরু এসময়েই।

এসবের বাইরে এসময়ের আরেকটা বড় ঘটনা হল, মাও-সেতুং-এর মৃত্যুর (১৯৭৬) পর দেং ঝিয়াও-পিং-এর নেতৃত্বে চিনের অর্থনৈতিক সংস্কার এবং আমেরিকা ও চিনের ভেতর কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন (১৯৭৯), যার প্রভাব আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিতে পড়বে। মনে করানো দরকার এসবের বছর দশেকের মধ্যেই সোভিয়েত ও কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যের পতন হবে। লক্ষ্য করার বিষয় বিশ্ব-রাজনীতি ও অর্থনীতির এই উথালপাথালের ভেতর পাকিস্তান কিন্তু যথেষ্ট

সফল—২০১৯ সালের অগস্ট মাস পর্যন্ত ভারতকে লেজে খেলিয়েছে। খুব অবাক করার মতো ব্যাপার। কারণ ১৯৯১ সালের সংস্কারের পর ভারতের অর্থনীতি বহুগুণ মজবুত হয়েছে, তুলনায় পাকিস্তান নিম্নগামী। নিয়মমাফিক সেক্ষেত্রে ভারতের জোর বাড়ার কথা। কিন্তু ঘটেছে উল্টো। ৩৭০ ধারার অপসারণের প্রেক্ষিত ও ফলাফল বুঝতে আগে জানতে হবে কাশ্মীর সমস্যার পেছনে ভারতীয় রাজনীতির ভুমিকা কি ছিল। ভারতের মতো বড় দেশ কেন এতদিন ধরে গাল পেতে চড় খেয়ে গেল?

২

গোটা ব্যাপারটা পাকিয়েছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু (১৯৪৭-১৯৬৪)। ওনার সময়ে কাশ্মীর তিন ভাগ হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৮ সালের ভেতর এক-তৃতীয়াংশ দখল করে পাকিস্তান যাকে এখন পি-ও-কে বা 'পাক অধিকৃত-কাশ্মীর' বলা হয়। এতে ভারতের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার সরাসরি যোগাযোগের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। যার ফল এখন দেশকে ভুগতে হচ্ছে। এরপর ১৯৬২ সালে লাদাখ অঞ্চলের এক টুকরো (আকসাই চিন) দখল করে চিন। পরবর্তীতে এই দখল করা অংশগুলোর ভেতর দিয়ে চিন ও পাকিস্তানের ভেতর সংযোগকারী 'কারাকোরাম হাইওয়ে' হয়েছে। পাকিস্তানের গদর পোর্ট দিয়ে এখন ভারত এবং ভারত মহাসাগর এড়িয়ে চিনের তেল আমদানি হয়। পাক অধিকৃত-কাশ্মীরে চিন এখন ৬২ বিলিয়ন ডলারের 'চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর' বা সি-পি-ই-সি বানাবার তোড়জোড় করছে।

ভারতের মুরগি, সোনার ডিম পাড়ছে চিন আর পাকিস্তানে। ওদিকে ভারতকে জাহাজে করে ইরান গিয়ে সেখান থেকে ট্রাকে আফগানিস্তানে মাল পাঠাতে হচ্ছে। তাজিকিস্তান ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াতে চায়, কিন্তু যোগাযোগ করাই মুশকিল। কাস্পিয়ান সাগর ঘুরে তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান বা কাজাখস্তানে মাল যেতে সময় লাগে প্রায় দু-মাস। ম্যাপ দেখুন এই দেশগুলো আফগানিস্তানের প্রতিবেশী। তুরকেমিনিস্তান থেকে ভারতে গ্যাস পাইপলাইন আসার কথা ছিল, পাকিস্তান আটকে দিয়েছে।

এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য কাশ্মীরের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বোঝানো। পাকিস্তান সেটা আগে বুঝেছে বলেই ১৯৪৮ সালে একতরফা ভাবে কাশ্মীর

আক্রমণ করে। ভারত ভাগের পর, কাশ্মীর কোনদিকেই না গিয়ে স্বাধীন ভাবে থাকতে চেয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ২২শে অক্টোবর পাকিস্তান কাশ্মীরে হানাদার পাঠিয়ে দেয়। আক্রমণের মুখে রাজা হরি সিং কাশ্মীরের ভারতভুক্তির প্রস্তাবে সাড়া দিলে, ভারত কাশ্মীর রক্ষায় সৈন্য পাঠায়। সেটাই প্রথম ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ।

এই অবধি ঠিকই ছিল। গোল বাধল ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে, ভারতীয় সেনার প্রতি-আক্রমণের মুখে পাকিস্তান যখন পিছু হটছে তখন নেহরু গেলেন ইউনাইটেড নেশনসে বিচার চাইতে। ভারতের বক্তব্য ছিল দুটো—স্বাধীন কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করে পাকিস্তান ভারতভাগের চুক্তি ভেঙেছে এবং কাশ্মীর এখন ভারতের অঙ্গ। ফল হল উল্টো। প্রথম জাতিসঙ্ঘ ভারত পাকিস্তানকে অবিলম্বে যুদ্ধ থামাতে বলে। তখন পাকিস্তান কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ দখল করে আছে। সুতরাং সেটা তার দখলেই থাকল। এরপর সাত মন তেল পুড়িয়ে, পাকিস্তানের দাবীতে সায় দিয়ে, ইউনাইটেড নেশনস বলল কাশ্মীরের লোকের মতামত নেওয়া দরকার (plebiscite) তারা কোন দিকে যাবে!

শুনতে ভালো লাগতে পারে, কিন্তু ভারতভাগের চুক্তিতে এমন কোন বিধান ছিল না। থাকলে পশ্চিম পাকিস্তান হত কিনা সন্দেহ! বালুচিস্তান যে আজও পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতার জন্যে লড়ছে, ভারতভাগের সময়ে কি তাদের মতামত নেওয়া হয়েছিল? বরং কাশ্মীরের রাজা হরি সিং বেশ আধুনিক ছিলেন। যুদ্ধ বিগ্রহ হবার আগেই উনি আজকের ভুটানের মতো কাশ্মীরে বিধানসভা গড়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে ছিলেন। আসলে দেশ স্বাধীন হবার আগে আমাদের দেশে সাধারণ মানুষদের মতামত জানাবার কোন সুযোগ ছিল না। ১৯৩৫ সালের বিধানসভা আইনের বলে কেবলমাত্র সমাজের মান্যগণ্যরাই ভোট দিতে পারত। তবে কাশ্মীরে নতুন করে ভোট নেওয়া যায়নি। কারণ সেই পাকিস্তান। জাতিসংঘ দুপক্ষকেই কাশ্মীর থেকে সেনা সরাতে বলেছিল, পাকিস্তান সরায়নি। কিন্তু সেই যে নেহরু জাতিসংঘকে ডাকলেন, তার খেসারত ভারতকে সাত দশক ধরে দিতে হল। পাকিস্তান কথায় কথায় জাতিসংঘের ভয় দেখাত। পাকিস্তানের মতে কাশ্মীর ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ই নয়! যারা অন্যায় করল, তারাই ভয় দেখায় এমন উদাহরণ পৃথিবীতে আর কটা আছে সন্দেহ। নেহাত ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ সালে তৃতীয় পাকিস্তান যুদ্ধে জিতে কান

ধরিয়ে সিমলা চুক্তি করিয়েছিলেন তাই রক্ষে। পূর্ব-পাকিস্তান (বাংলাদেশ) হারিয়ে পাকিস্তান তখন বেদম, তাই আন্তর্জাতিক সীমান্ত সেই লাইন-অফ-কনট্রোলে আটকে গেল। কাশ্মীরে তৃতীয় পক্ষের নাক গলাবার সুযোগ কমল। তবে ফাঁড়াটা থেকেই যাচ্ছিল। সেটা এবার ঠিক হল। জম্মু-কাশ্মীর বলে কোন রাজ্যই নেই আর। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে কিন্তু তার ম্যাপ আলাদা। পুরনো পাপ শেষ।

কিন্তু নেহরু শুধু তৃতীয় পক্ষকে নাক গলাবার সুযোগ করে দেননি। ১৯৫০ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যে ওনার একগাদা ভুল সিদ্ধান্তের ফলে ভারত কার্যত একঘরে হয়ে পড়ে। বিশ্বরাজনীতিতে ভাল-খারাপ, ন্যায়-নীতি বলে কিছু হয় না। পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে, যথাসম্ভব আখের গুছিয়ে নেওয়াটাই লক্ষ্য। এখানে কোন চিরস্থায়ী বন্ধু নেই। বুদ্ধি, গায়ের জোর বা পয়সা ছড়িয়ে বাগ মানাতে হবে। নেহরু পণ্ডিত মানুষ ছিলেন, কিন্তু এই ঘোর সত্যিটা বুঝেছেন বলে কাজে প্রমাণ নেই।

নেহরু চেয়েছিলেন ভারত শান্তির পারাবত হবে, ডান ও বাম দুয়ের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখবে এবং চিন ও আরও অনেক নতুন-স্বাধীন দেশকে সঙ্গে নিয়ে তৃতীয় শক্তি হয়ে উঠবে—নন-অ্যালাইন্ড মুভমেন্ট বা 'ন্যাম'। ১৯৪৯ সালে চিনের কম্যুনিস্ট পার্টি চিয়াং-কাইশেকের জাতীয়তাবাদী পার্টিকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করে। চিয়াং-কাইশেক ঘাঁটি গাড়েন তাইওয়ানে। তাইওয়ান চিন থেকে আলাদা হয়। আমেরিকা মাওয়ের চিনের বদলে তাইওয়ানকে কূটনৈতিক মর্যাদা দেয়। ১৯৫০ সালের অগস্ট মাসে আমেরিকা থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে প্রস্তাব আসে চিনকে সরিয়ে ভারতকে ইউনাইটেড নেশনস বা ইউএন-এর সিকিউরিটি কাউন্সিলে বা সুরক্ষা পরিষদে স্থায়ী পদ দেওয়ার। নেহরু উল্টে চিনের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন! অথচ তার দু-বছর আগেই নেহরু ইউনাইটেড নেশনসে পাকিস্তানের একতরফা ভাবে কাশ্মীর আক্রমণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নাক-ঘষা খেয়ে এসেছেন। সিকিউরিটি কাউন্সিলে স্থায়ী পদ থাকলে ভারতকে এতদিন পাকিস্তানের অত্যাচার সহ্য করতে হত না।

এরপর ১৯৫৪ সালে নেহরুর চিন সফর এবং ১৯৫৫ সালে চৌ-এন লাইকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ ন্যামের প্রথম সম্মেলন, "হিন্দি-চিনী ভাই ভাই" স্লোগানের উৎপত্তি। এবং তারপর ১৯৬২ সালে চিনের তিব্বত দখল ও

ভারতের লজ্জাজনক হার। সে এমনই হার যে নেহরু গরম গরম কথা বলে যুদ্ধে নামার পর, আমেরিকার কাছে কাতর সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন কিন্তু আমেরিকা কিছুই করেনি। ভারতের চিঠির প্রতিলিপি প্রাক্তন কূটনীতিক ও প্রাক্তন কংগ্রেস মন্ত্রী নটবর সিং-এর আত্মজীবনী "ওয়ান লাইফ ইজ নট এনাফ" বইতে আছে। পাড়ার কোন গুরুত্বপূর্ণ লোক যদি মোড়ের মাথায় দু-থাপ্পড় খেয়ে যায়, তাহলে কি তার আর মান সম্মান থাকে? চিনের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে ভারতেরও তাই হল। চিন তখন ভারতের থেকেও দরিদ্র দেশ। ভারতের সব প্রতিবেশীর সাহস বাড়ল, বিশেষত পাকিস্তানের। ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানের তদানীন্তন বিদেশমন্ত্রী ও পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো কাশ্মীর নিয়ে জাতিসংঘ সরগরম করে রাখতেন। বক্তৃতা দিতে গিয়ে "ভারতীয় কুকুর"ও বলেছেন।

কাশ্মীর নিয়ে বিশ্বের দরবারে ভারতের টালমাটাল পরিস্থিতির লাভ কাশ্মীরের রাজনীতিও তুলেছে। ভারতভুক্তির নিয়ম হিসেবে সব করদ রাজ্যের নিজস্ব নিয়ম কানুনের কিছু স্বাধীনতা ছিল। সে জন্যে আজও মহারাষ্ট্র, গুজরাট থেকে নাগাল্যান্ড কি সিকিম পর্যন্ত নানা রাজ্যে কিছু আলাদা নিয়ম কানুন আছে। ঠিক হয় কাশ্মীরের অন্তর্বর্তীকালীন বিধানসভা (কন্সটিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি) সবদিক খতিয়ে দেখে নতুন (ভারতীয়) সংবিধান বলবৎ করার জন্যে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে সুপারিশ জানাবে। এই মর্মে ভারত সরকার সংবিধানে ৩৭০ ধারা আনে যাতে কাশ্মীরে নতুন সংবিধান জারি হবার প্রক্রিয়া চলাকালীন দিল্লি, প্রতিরক্ষা ও বিদেশনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে মন দিতে পারে। ভারতভুক্তি সম্পন্ন হলে স্বাভাবিক নিয়মে ৩৭০ ধারা বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ ভারতের সংবিধানে কাশ্মীরের জন্যে বিশেষ কিছু ছাড় থাকবে। কিন্তু কাশ্মীরের আলাদা সংবিধান থাকবে না। গন্ডগোল হল, ৩৭০ ধারায় পরিষ্কার করে বলা ছিল না, যে নতুন সংবিধানের সুপারিশ না করলে কি হবে। আবদুল্লা এই সুযোগটাই নেন। কোন সুপারিশ ছাড়াই কন্সটিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। ফলে সাত দশক ধরে কাশ্মীর নিজস্ব সংবিধান, পতাকা নিয়ে ভারতের ভেতর আলাদা দেশ হয়ে থেকে গেছিল।

কিন্তু কথা হল, এত বড় গোলযোগ হল কি করে। চিন কেন ন্যাম ছেড়ে ভারতকে আক্রমণ করে বসল? আর আমেরিকা কেন কম্যুনিস্ট চিনের বিরুদ্ধে ও ভারতের পক্ষে দাঁড়াল না? একটা উত্তর হল, ততদিনে চিন ও সোভিয়েত

রাশিয়ার সম্পর্ক তলানিতে, আর আমেরিকার প্রধান শত্রু ছিল সোভিয়েত। আরেকটা বড় কারণ হল, আমেরিকার বাড়ানো হাত এড়িয়ে এবং পাকিস্তানের কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে নেহরু তখন সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে হেলেছেন। সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থনীতি গড়ছেন। রাশিয়া অস্ত্রও দিচ্ছে। কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে গাঁটছড়াটা তত শক্ত নয়— তেমন হলে হয়তো রাশিয়া ভারতের পাশে দাঁড়াত, ইন্দিরা যা ১৯৭১ সালে করে দেখিয়েছেন। আমেরিকা আর চিনের হুমকির মুখে, রাশিয়াকে পাশে রেখে, ইন্দিরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জিতেছিলেন।

সোজা কথায় নেহরুর নীতি, উপমহাদেশে ভারতকে একঘরে করে ফেলেছিল এবং তার পুরো সুযোগ নিয়েছে শত্রুরা। ১৯৭১ এর যুদ্ধে হারার পর পাকিস্তান কাশ্মীরকে পাখির চোখ করে। এবার সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে না। সত্তরের দশকের শেষ, আশির দশকের শুরুতে এসে পাকিস্তানে জিহাদ-ফ্যাক্টরি খুলে গেছে। এই নিয়ে পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি পারভেজ মুশারফের জবানবন্দিও আছে। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বিদায় নেয় ১৯৮৯ সালে, এবার আসরে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট তালিবান। সুতরাং ২০০১ সালে আল কায়েদার আমেরিকা আক্রমণ পর্যন্ত পাকিস্তানকে আর কিছু ভাবতে হয়নি।

অন্যদিকে ভারত ঘরে বাইরে বিপর্যস্ত। পাঞ্জাবে খালিস্তানি আন্দোলন, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহারে মাওবাদী আর উত্তর পূর্ব ভারত অশান্ত। মাওবাদীদের বাদ দিলে বাকি দুটোতেই পাকিস্তানের হাত ছিল। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর ভারত আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিতে বেকায়দায়। তাছাড়া শ্রীলঙ্কায় সিভিল ওয়ারে জড়িয়ে পড়ার খেসারত দিতে হচ্ছে। বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতা চরমে। সেনা সরেছে কিন্তু সেনা শাসকের তৈরি বিএনপি সঙ্গে কুখ্যাত জামাত ক্ষমতায়। এদিকে নেপাল সুযোগ বুঝে চিনের কাছ থেকে অস্ত্র আমদানির বরাত দিয়েছে যার ফলশ্রুতিতে ভারত দেশ এবং বিদেশ থেকে নেপালে মাল সরবরাহে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। সে নিয়ে সংঘাত শেষ হতে না হতেই, নেপালে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এদিকে ষাটের দশকে সেনা সরকার আসার পর ভারত, মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি, সেখানে চিন একাই করে খাচ্ছে।

সব মিলিয়ে ২০১০ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের বরফ গলার আগে

দক্ষিণ এশিয়ায় ভুটান ছাড়া ভারতের প্রায় কোন বন্ধু ছিল না। ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধীর আমলে হওয়া সার্কে— শ্রীলঙ্কা, নেপাল, বাংলাদেশ প্রায় সবাই পালা করে পাকিস্তানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভারতকে টাইট দিত। পাকিস্তানের, চিনের পোয়াবারো। উত্তর-পূর্বের সন্ত্রাসী দলগুলোর বড় অংশ ডেরা বেঁধেছে বাংলাদেশে; বাকিরা মিয়ানমারে। চিন থেকে চোরাপথে অস্ত্রও ঢুকছে দেদার।

আপনার বাড়িতে চুরি হলে, প্রতিবেশীরা যদি হাততালি দেয়, তাহলে নির্ঘাত জানবেন প্রতিবেশীদের কাছ থেকেই চোর খবর পাচ্ছে। নেপালের সঙ্গে পাকিস্তানি জঙ্গিদের যোগাযোগ তো সুবিদিত। ১৯৯৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর, নেপালের ত্রিভুবন এয়ারপোর্ট থেকে ওড়ার পর, ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের আইসি-৮১৪ হাইজ্যাক করে ১৭৬ জন যাত্রী সমেত আফগানিস্তানের কান্দাহারে নিয়ে যাওয়া হয়। দিল্লিতে তখন অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকার। যাত্রীদের মুক্তিপণ হিসেবে ভারত মাসুদ আজাহার সমেত তিন কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদীকে ছাড়তে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে এরাই মুম্বাই হামলার ছক বানিয়েছেন, পাকিস্তানের জেহাদি কারখানার ডিরেক্টর হয়েছেন এবং কাশ্মীরে হাজারে হাজারে মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছেন।

আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াতে পারলে খানিকটা সামাল দেওয়া যেত। ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক সংস্কারের পর সম্পর্ক বাড়ছিল কিন্তু প্রথমত পাকিস্তান আমেরিকার পুরনো বন্ধু। দ্বিতীয়ত নেহরুর বিদেশনীতির ভূত তখনও ভারতের ঘাড়ে, আমেরিকার সঙ্গে পা-মেলাতে গেলেই বামেরা হট্টগোল জুড়ে দেবে। সেটা কোয়ালিশন সরকারের যুগ। মনে নেই, ২০০৮ সালে পারমাণবিক অস্ত্র-সংবরণ চুক্তিতে যোগদানের কথায় বামেরা কিভাবে ইউপিএ সরকার ছেড়ে বেরিয়ে গেল? অথচ সেই চুক্তির জন্যে উন্নত বিশ্ব ভারতের প্রায় সব দাবী মেনেছিল। একই রকম ঘটনা ঘটেছিল ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশনে যোগদান নিয়ে, যা ছাড়া আজ চলাই যায় না।

যদি ভাবেন কাশ্মীর নিয়ে বলতে বসে মিয়ানমারে কি পারমাণবিক চুক্তিতে গেলাম কি করে, তাহলে জানিয়ে রাখি ২০১৯ সালে ভারত যা ঘটাল সেটা কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় না। বিরাট প্রস্তুতি আছে। আবারও বলছি, বিশ্ব-রাজনীতি আদর্শবাদীতার জায়গা না। সময়, সুযোগ বুঝে কোপ মারতে হবে— অতীতে

ভারত সেটাই পারেনি, এবার পারল। সে কথায় যাবার আগে বলে রাখি ১৯৯১ সালে উদারীকরণ থেকে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর ক্ষমতায় আসার আগে, ভারত অন্তত দুটো সদর্থক কাজ করেছিল যা পাকিস্তানের বিপক্ষে গেছে।

প্রথমত ২০০১ সালে আল-কায়দার পিছু ধাওয়া করে মার্কিন সৈন্য কাবুলে পৌঁছাবার পর, আমেরিকার তদানীন্তন জর্জ বুশ সরকার ভারতের সাহায্য চায়। সামরিক সাহায্যের বদলে ভারত আফগানিস্তানের পুনর্গঠনের কাজে মুখ্য ভূমিকা নেয়। গত দু-দশকে ভারত সেখানে পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। বলাই বাহুল্য পাকিস্তান এতে খুশি হয়নি। কিন্তু আফগানিস্তানে ভারতের খুঁটি শক্ত হয়েছে। তার থেকেও বড় কথা ভারত-মার্কিন সম্পর্ক গভীর হয়েছে।

দ্বিতীয়ত ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের ভারত বিরোধিতার ইতিহাস বদলাতে চাইলে এবং উগ্রপন্থার গোড়া ধরে টান মারলে, দিল্লি তাতে সদর্থক ভূমিকা রাখতে চেয়েছে। ২০১০ সালে বাংলাদেশকে ২০০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য ও ৮০০ মিলিয়ন ডলার স্বল্প-সুদের ঋণ; ২০১১ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে আমদানি শুল্কের হার শূন্যতে আনা; বিদ্যুৎ বাণিজ্য শুরু করা— এসবই উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল বদলাবার প্রথম ধাপ ছিল।

মোদী ক্ষমতায় এসে আমেরিকা, ইসলামী দুনিয়ায় আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন, যার প্রভাব পড়েছে কাশ্মীর ও পাকিস্তানের ওপর। এই প্রথমবার পাকিস্তান একঘরে। সার্ক থাকল না গেল, কারো কিছু এসে যায় না। সার্ক ভেঙে ভারত, নেপাল, ভুটান আর বাংলাদেশ বিবিআইএন বানিয়েছে। বহুদিন ধরে ঘুমিয়ে থাকা বিমস্টেক জেগে উঠেই পুরোদমে কাজ শুরু করেছে, সেখানেও পাকিস্তান নেই। সবাই জানে পাকিস্তান থাকলে শুধু বাগড়া দেবে।

এদিকে পাকিস্তান-আমেরিকা সম্পর্ক আর আগের মতো নেই। আমেরিকা এখন এই অঞ্চলের শান্তি রক্ষায় ভারতের মতামতকে প্রাধান্য দেয়। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কছেদ হয়নি, তবে মাথায় টক-টক করে গাঁট্টা মারছে। ১৯৯৯ থেকে পাকিস্তানের জামাই আদরে থাকা মাসুদ আজাহারকে ২০১৯ সালের মে মাসে জাতিসংঘ "গ্লোবাল টেররিস্ট" ঘোষণা করেছে। গত কয়েক বছর ধরে চিনের

আপত্তিতে সে কাজ করা যাচ্ছিল না। এবার আর চিন বদনাম কুড়োতে যায়নি কারণ, সন্ত্রাসবাদীদের হাতে টাকার যোগান বন্ধ করার জন্যে বিশ্বব্যাপী সংগঠন এফএটিএফ যে কোন দিন পাকিস্তানকে কালো-তালিকাভুক্ত করতে পারে। তাছাড়া উইঘুর মুসলমানদের ওপর অত্যাচার নিয়ে চিন নিজেই চাপে আছে, কাশ্মীর নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতে গেলে উল্টে বিপদ হতে পারে।

তবে পাকিস্তানের বিপদ এখানেই শেষ না। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো সৌদি আরব এখন ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াতে চাইছে। ২০১৯ সালের মার্চ মাসে সৌদির আমন্ত্রণে ভারত প্রথমবার ইসলামিক দেশগুলির সংগঠন ওআইসি-র বিদেশমন্ত্রীদের সম্মেলনে 'সম্মানীয় অতিথি' বা গেস্ট-অফ-অনার হিসেবে যোগ দেয়। ভারতে পাকিস্তানের থেকে বেশি মুসলমান থাকে সুতরাং এই সম্মেলনে ভারতের আগেই ডাক পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেটা হয়নি পাকিস্তানের বাধায়— এবার হল। রাগে পাকিস্তান ওআইসি-র মিটিং-এ যায়নি, কিন্তু তাতে কিছুই বদলাল না। ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি কাশ্মীরের পুলওয়ামায় এক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদী হামলায় কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বাহিনীর ৪০ জন সদস্য মারা যায়। ভারত এর জন্যে পাকিস্তানকে দায়ী করে। এর ছ-দিন বাদে সৌদি যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমান পাকিস্তান ঘুরে ভারতে আসেন। ফেব্রুয়ারির ২০ তারিখে দু-দেশের যৌথ ইস্তেহারে পুলওয়ামায় সন্ত্রাসবাদী হামলার নিন্দা করা হয়। ঠিক এর ছ-দিন বাদে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির ২৬ তারিখে ভারত পাকিস্তানের বালাকোটে বিমান হামলা করে। বালাকোট পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের থেকে মোটে ২০০ কিমি দুরে অবস্থিত। এ ঘটনার তাৎপর্য হল, পাকিস্তানের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র আছে তাই কিছু করা যাবে না এ ধারণা থেকে মুক্তি। আরও লক্ষণীয়, আমেরিকা সহ বিশ্ব-রাজনীতি ভারতের পাশেই রইল। পাকিস্তান হালে পানি পেল না।

এতেই শেষ না। অগস্টের ৬ তারিখে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদ হবার প্রস্তাব সংসদে গৃহীত হয়েছে তার ঠিক এক সপ্তাহ বাদে অগস্টের ১২ তারিখে জানা যায়, সৌদি আরবের সরকারি তেল সংস্থা 'আরামকো', ভারতের রিলায়েন্স কোম্পানির তেল পরিশোধন ব্যবসায় ১৫ বিলিয়ন ডলার (১,০০,০০০ কোটি টাকার বেশি) বিনিয়োগ করবে। এরপর নভেম্বরের ২ তারিখে ভারত জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখকে আলাদা দেখিয়ে ভারতের নতুন ম্যাপ প্রকাশ করে। একই সময়ে

ভারতের সরকারি তেল কোম্পানিগুলির সঙ্গে সৌদি আরামকো ৬০ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে এক সুবিশাল তেল পরিশোধনাগার বানাবার চুক্তি করেছে।

এত কর্মকাণ্ডের মধ্যে পাকিস্তানের ভূমিকা কোথায়? পাকিস্তান বোমা ছুঁড়লে, ভারতে অস্থিরতা তৈরি করলে তো সৌদিরও ক্ষতি হবে। আর সৌদিকে চটালে ইসলামিক দুনিয়ায় পাকিস্তান কোথায় যাবে, আমেরিকা কি বলবে? পকেটেও তো টাকা নেই। সুতরাং পাকিস্তানের এখন হাত-পা বাঁধা। কিল খেয়ে হজম করতে হচ্ছে।

৩

আমি বিশ্বাস করি, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কাশ্মীরে নেই। এর প্রমাণ তো আমাদের হাতের কাছেই আছে। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদ হলে বাংলাদেশে কেন উত্তেজনা তৈরি হয়? যদি মানবাধিকার, স্বাধীনতা ইত্যাদিই বিষয় হয় তাহলে গিলগিট-বাল্টিস্তানের কথা কেউ বলে না কেন? এই অঞ্চলটা পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে পড়ে। বাল্টিরা আজ সাত দশক ধরে পাকিস্তানের হাত থেকে মুক্তি চাইছে। উইকিপিডিয়া বলছে এরা অতীতে বৌদ্ধ ছিল পরে মুসলমান হয়েছে। এখন সেখানে ৬০% শিয়া মুসলমান, ৩০% সুফি আর বাকি ১০% সুন্নি। কি ভাবছেন, উপমহাদেশে সুন্নিরা সংখ্যাগুরু, তারা শিয়া বা সুফিদের জন্যে কেন বলবে? তাহলে উইঘুর মুসলমানদের দেখুন। উইঘুররা বাল্টিস্তানের প্রতিবেশী, চিনের শিনজাং প্রদেশে থাকেন। এরা বৌদ্ধ থেকে সুন্নি মুসলমান হয়েছেন। ফিনান্সিয়াল টাইমস (লন্ডন), বিজনেস ইনসাইডার (নিউইয়র্ক)—এরকম নামকরা কাগজে গত কয়েকমাসের রিপোর্ট বলছেন—মোবাইলে কোরান পড়লে কিংবা মসজিদের জন্যে টাকা তুললেও চিনা পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একটা রিপোর্টে দেখছি শুধুমাত্র মোবাইল অ্যাপ দিয়ে কোরান পড়ার অপরাধে ৪০,০০০ উইঘুরকে জেলে পোরা হয়েছে। আরেকটা কাগজ বলছে, চিনা পুলিশ অন্তত ১৫ লক্ষ মুসলমানকে ক্যাম্পে আটকে রেখেছে। কিন্তু তবুও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান জাতিসংঘে গিয়ে বিচার চাইছেন না।

প্রসঙ্গত এই গিলগিট-বাল্টিস্তান ও শিনজাং দিয়েই কিন্তু চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর যাবে! আর সে প্রকল্প রূপায়ণে চিন, পাকিস্তানকে ৬২ বিলিয়ন ডলার ধার দেবে। ধার নিয়ে পাকিস্তানটাই বিক্রি হয়ে যাবে কিনা সে

প্রশ্ন আছেই। কিন্তু দেউলিয়া হয়ে যাওয়া পাকিস্তানের কাছে টাকা পাওয়া যে বিরাট ব্যাপার সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই আশির দশক থেকে আফগানিস্তানের জুজু দেখিয়ে পাকিস্তান আমেরিকার কাছ থেকে টাকা আনে। গত তিরিশ বছরে ১৩ বার আইএমএফ কাছ থেকে অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলার জন্যে সাহায্য (bailout) নিয়েছে। ২০১৯-এর শুরুতে দেশে এক সপ্তাহের আমদানি করার মতোও টাকা ছিল না। অনেক ধরা-করার পর আইএমএফ আবার টাকা দেবে বলেছে।

মোদ্দা কথা হল, চিনের বিরুদ্ধে পাকিস্তান রা-টি কাড়বে না, সে সুন্নি-মুসলমানের যা হয় হোক। সৌদি সহ, আরব দেশে চিনের যথেষ্ট প্রভাব। অনেকেই মনে করেন, অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকা হয়তো আর আরবে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পাহারা দেবে না। (কারণ তেল ফুরিয়ে আসছে)। তখন কে বাঁচাবে? এদের নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি তো লেগেই আছে। সুতরাং চিনকে চটানো যাবে না। অর্থাৎ রাজনৈতিক কারণে ইসলামী বিশ্বও উইঘুরদের কথা তেমন বলছে না। তাহলে বলছে কে? আমেরিকা বলছে।

অথচ এই একই আমেরিকা ১৯৮৯ সালে বার্লিন দেওয়াল পতনের ভেতর দিয়ে কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যের পতন শুরু হবার সময় থেকে এই কয়েকবছর আগে অবধি, চিনের দোষ খুঁজে পেত না। বেজিং-এর তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে গণতন্ত্রের দাবীতে আন্দোলনের পর (১৯৮৯) চিনে আরও বহু গন্ডগোল হয়েছে। তিব্বত আন্দোলন ২০০৮ সালে, উইঘুর রায়ট ২০০৯ সালে—কোনকিছু নিয়েই বিশেষ হেলদোল হয়নি। কেন? উত্তরটা দিয়েছে "দি ইকোনোমিস্ট" পত্রিকা ঃ চিনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি থেকে সবার লাভ হচ্ছিল তাই সবাই চুপ ছিল। অর্থাৎ রাজনীতি।

এখন ব্যাপারটা ঠিক উল্টে গেছে। আমেরিকার সঙ্গে চিনের বাণিজ্য যুদ্ধ চলছে। উন্নত বিশ্ব ভয় পাচ্ছে যে চিন তাদের বাজার, রাজনৈতিক প্রতিপত্তিতে খাবলা মারতে পারে। সুতরাং আমেরিকা বলছে। আমেরিকা বললে ইউরোপ বলবে। রাষ্ট্রক্ষমতা বললে মিডিয়া বলবে, এটাই নিয়ম। এটাই রাজনীতি। এনিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাও দিয়েছি। এই রাজনীতির কারণেই কাশ্মীর নিয়ে দেশে ও বিদেশে নানা কথা হয়েছে। অথচ কাশ্মীর থেকে হিন্দু পণ্ডিতদের বিতাড়নের কথা বিশেষ শোনা যায়নি। ৩৭০ ধারা ওঠার আগে অনেকেই জানত

না, যে কাশ্মীরে লক্ষ লক্ষ মানুষ বসবাস করছেন যাদের ভোটাধিকার নেই—এদের মধ্যে পাকিস্তান থেকে শরণার্থী হয়ে আসা, হিন্দু ও শিখরাও আছেন। ভোটাধিকার নেই মানে ভারত সরকার যে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কাশ্মীরে ব্যয় করত তার কানাকড়িও এদের কাছে পোঁছত না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইংরেজি জানেন না হয়তো, কিন্তু এই রাজনীতিটা বোঝেন। ২০১৪ সালে সরকার শুরু করেই উনি প্রথম পার্শ্ববর্তী দেশে ভারতের প্রভাব বাড়াবার কাজে লেগে পড়েন। এই নীতির নাম—"নেবারহুড ফার্স্ট"। মনে থাকবে হয়তো প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বিদেশ সফর ছিল ভুটানে, আর বিদেশমন্ত্রী প্রয়াত সুষমা স্বরাজ গিয়েছিলেন বাংলাদেশে। এই নীতির সরাসরি ফল হল—বাংলাদেশে ভারতীয় সাহায্য গত ছ-বছরে এক বিলিয়ন ডলার থেকে দশ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার—পারিপার্শ্বিক যে কোন দেশ দেখুন—ভারত এখন চিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাস্তা, রেললাইন, পোর্ট বানাচ্ছে। ইরানে পোর্ট আর শিল্পক্ষেত্র হচ্ছে। আফগানিস্তানের সঙ্গে এতদিন প্লেনে করে বাণিজ্য হত। এখন ইরান থেকে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। আগামীতে এখানে রেল বসবে। তাজিকিস্তানের সঙ্গে ভারতের এখন দারুণ সম্পর্ক। ইরান থেকে আজারবাইজান হয়ে রাশিয়া পর্যন্ত ৭২০০ কিমি রাস্তা ও রেল হচ্ছে, তাতেও ভারত অংশীদার। মালদ্বীপ, চিনের ঋণ নিয়ে ডুবে যাচ্ছিল। ভারত টাকা দিয়েছে চিনের ঋণ শোধ করার জন্যে। শ্রীলঙ্কা ঋণ শোধ করতে পারেনি বলে চিন পোর্ট নিয়ে নিয়েছে। ভারত সেখানে একটা এয়ারপোর্ট কিনে নিতে চেয়েছে।

এসবের সঙ্গেই বেড়েছে সামরিক শক্তি। কিছুদিন আগেই সৌদি আরবের রিয়াধে একটা সম্মেলনে গিয়ে শুনছিলাম কিভাবে ভারত চিনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এশিয়া জুড়ে নানা সামরিক ঘাঁটি বানিয়েছে ও বানাচ্ছে। এগুলো করার উদ্দেশ্য ছিল পাড়া-প্রতিবেশীকে বোঝানো যে শক্তির দৌড়ে শুধু আমেরিকা আর চিন না, ভারতও আছে। চিন যদি ভারতের নাকের ডগায় নেপালের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে তাহলে ভারতও চিনের প্রতিবেশী মঙ্গোলিয়াকে সাহায্য করবে। মঙ্গোলিয়া আর্থিক ভাবে দুর্বল দেশ। ভারতের আর্থিক সাহায্যে সেখানে তেল পরিশোধনাগার বানানো হচ্ছে।

সৌদি আরব যে পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে, ভারতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কথা বলছে, বিনিয়োগ করছে বা ইসলামিক দেশের সম্মেলনে ডাকছে, তা

এসবেরই ফল। সবাই মনে করছে, ভারতের শক্তি আছে এই অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক সাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখার। এই সবাইয়ের মধ্যে কিন্তু আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ইত্যাদিরাও আছে। এদের মধ্যে আমেরিকার সমর্থনটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে ভারতের অবস্থান এখন অনেক ওপরে হয়তো চিনের সমান।

এর মানে এই নয় যে ভারত চিনের মতোই ধনী, কিংবা ভারতের সামরিক ক্ষমতা চিনের সমান। ১৯৭৮ থেকে ২০১০ অবধি চিন যখন দুদ্দাড় করে এগোচ্ছিল, আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম। সুতরাং সে এগিয়ে আছে। তফাতের মধ্যে ভারত আর আগের মতো ঘুমোচ্ছে না, ফলে ফারাকটা কমছে। সব থেকে বড় কথা হল, দেশের নেতৃত্ব আর আগের মতো ফাঁকা আদর্শের বুলি কপচাচ্ছে না, সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে। এই নীতির প্রমাণ হল ২০১৬ সালের অগাস্ট মাসে আমেরিকার সঙ্গে মিলিটারি লজিস্টিক্স চুক্তি। ভারতের বিদেশনীতিতে এটা একটা বড় মোড়।

এর মানে দু-দল একসঙ্গে লড়াই করবে তা নয়। একে অন্যকে নানা ভাবে সাহায্য করবে, তারমধ্যে অন্যের পরিকাঠামো ব্যবহারের সুযোগও আছে। একটা কাল্পনিক উদাহরণ হল, ভারতীয় বায়ুসেনা হয়তো প্রয়োজনে আমেরিকার কোন সেনা ঘাঁটি থেকে তেল ভরবে। যেটা সবথেকে জরুরি সেটা হল, ভারত কিন্তু পাকিস্তানের মতো কারো কাছে মাথা মুড়াতে যায়নি। বরং ঠিক উল্টোটা। উন্নত বিশ্ব এমন কাউকে খুঁজছিল যে এশিয়ায় চিনের একাধিপত্য ঠেকায়। ভারত তাদের বোঝাতে পেরেছে যে এশিয়ায় ভূ-সাম্য রাখতে হলে তাকেই সমর্থন করা জরুরি, নইলে চিন সবাইকেই ভোগাবে। অর্থাৎ ভারত চালকের আসনে।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। চিন, এশিয়া আর আফ্রিকাকে রেল, রাস্তা, পোর্ট দিয়ে জুড়ে দেবার পরিকল্পনা করেছে। এর পোশাকি নাম 'বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ'। পোশাকি উদ্দেশ্য, সবার উন্নয়ন। কিন্তু বাস্তব উদ্দেশ্য, মহাদেশ জুড়ে নিজের প্রভাব বিস্তার। পাকিস্তানে সিপিইসি-ও এই প্রকল্পের অন্তর্গত। ভারত এতে যোগ দেয়নি। উল্টে জাপানের মতো সহযোগী দেশগুলোকে নিয়ে ভারতের পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে যোগাযোগের বিস্তার ঘটাচ্ছে। কিন্তু একই সঙ্গে ভারত কিন্তু আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে একজোট

হয়ে চিন উপসাগরে নজরদারি চালাবার প্রস্তাবে সায় দেয়নি। আর মোদী এবং চিনের সর্বময় কর্তা শি জিনপিং-এর ভেতর যোগাযোগ অব্যাহত। ২০১৯ সালে দুজনের ভেতর দুবার আলোচনা হয়েছে। তারমধ্যে একবার চিনের রাষ্ট্রপতি ভারতে এসেছেন।

অর্থাৎ মোদীর বিদেশনীতির মুল কথা হল—তুমি তোমার মতো থাক, আমি আমার মতো—আমার এলাকায় দাদাগিরি করতে এসো না। জওহরলাল নেহরুর নীতির মূল সুরটা ধরে রেখে তাতে "ছাপান্ন ইঞ্চি" মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই নীতির প্রয়োগ দেখতে পাই জম্মু-কাশ্মীরের ম্যাপ বদলের ভেতর। চিন কোন কালের কি সব ঐতিহাসিক তথ্য দেখিয়ে এতদিন ভারতের লাদাখকে 'বিতর্কিত অঞ্চল' বলত। মানে, এখানে কিছু করতে হলে চিনের মত নিতে হবে। এক ধাক্কায় লাদাখকে আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করে, মোদী সব 'বিতর্ক'কে ইতিহাস বানিয়ে ছেড়েছেন। সাধে মার্কিন প্রতিরক্ষা সেক্রেটারি জেমস মাটিস বলেছিলেন—"ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের (ইন্দো-প্যাসিফিক) শান্তি বজায় রাখতে এখন ভরসা ভারত"। খবরটা বেরিয়েছিল, চিনের হংকং থেকে প্রকাশিত 'সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট' কাগজে।

৪

কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের বাড়াবাড়ির কারণ ছিল, কৌশলগত। অখণ্ড কাশ্মীর থাকলে পাকিস্তান আর চিনের ভেতর সিপিইসি হত না। তাছাড়া ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের দায় আমরা এখনো বয়ে বেড়াচ্ছি। ভারতের নাকে দু-চারটে দিতে পারলে এই অঞ্চলের একটা বিরাট সংখ্যক মুসলমানের কাছে বাহবা জোটে। সেটা জোটানোর পেছনে, স্বাধীনতা-উত্তর ভূ-রাজনীতি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সামরিক শাসনের বিরাট অবদান। স্বাধীন হবার পরেও বাংলাদেশের রাজনীতি এই ১০ বছর আগে পর্যন্ত যে পাকিস্তানের দেখানো পথে চলেছে সে তো আর এমনি নয়! কাশ্মীরের একটা অংশ দখল করে নিয়ে এবং এতদিন ধরে কাশ্মীরকে অশান্ত করে রেখে পাকিস্তান তার লক্ষ্যে আংশিক সফল। এবার তার চুপ করার পালা। বিশ্ব-রাজনীতিতে এখন তার প্রয়োজন কম। তাছাড়া ওই উগ্রপন্থী তৈরির কারখানার ব্যবসাটাও এখন আফ্রিকা বাদ দিলে আর বিশ্বজুড়ে তেমন চলছে না। আফ্রিকাতেও হয়তো আগামী দিনে চলবে না।

ভারত সেই আশির দশক থেকে যখন উগ্রপন্থা সয়েছে, পৃথিবীতে কেউ গা করেনি। কিন্তু এক 'নাইন-ইলেভেন' সবার টনক নড়িয়ে দিয়েছে। দুধ দিয়ে কালসাপ পোষায় আর কেউ রাজি নয়। দেশগুলোর ভেতর তথ্যের আদান-প্রদান বেড়ে গেছে। তাছাড়া টেকনোলজির কারণে এখন আর পাহাড়-জঙ্গলে লুকিয়ে থেকেও লাভ নেই। স্যাটেলাইট খোঁজ রাখছে। টেনে বার করে এনে মারবে, যেমন মারল আইসিস-এর পাণ্ডা আবু বকর আল-বাগদাদিকে, যেভাবে টেনে বার করেছিল বিন লাদেনকে। এখনও অন্তিম লগ্নে কিছু কম্যান্ডোর দরকার পড়ছে। আগামীতে হয়তো তারও দরকার পড়বে না। গুলি বা বোমা কিন্তু মহাশূন্য থেকে ধেয়ে আসবে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রটা ক্রমাগত স্টার-ওয়ার্সের মতো হয়ে যাচ্ছে। শুনতে হয়তো অদ্ভুত লাগছে, কিন্তু সারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখুন, কোন আঙ্কল হো, চে গ্যেভারা কিংবা ফিদেল কাস্ট্রোর দেখা পাচ্ছেন? ভারতে, পশ্চিমবঙ্গে তাকিয়ে দেখুন, বন্দুক হাতে গামছা-ঢাকা কিষেনজি-দের জমানা শেষ। কোন ফেলুদার দরকার নেই, হাতের মোবাইলটাই আপনার পেছু ধাওয়া করছে, ২৪ ঘণ্টা।

পাকিস্তানের পক্ষে হয়ত এখন এত জ্ঞান সহ্য করা মুশকিল। সত্তর বছর ধরে যে সব সাপ তৈরি করেছে, সেগুলো ফণা উঁচিয়ে আছে, ছোবলও মারছে। একটা রিপোর্টে দেখছি, শুধু ২০১৮ সালে পাকিস্তানে ২৬২টি সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে, আর তাতে ৫৯৫ জন মারা গেছে। গল্পের দৈত্যের মতো। কাজ দাও নইলেই অকাজ করব। এই কাজের তাগিদেই পাকিস্তান এখন চেষ্টা করছে খালিস্তানিদের হাওয়া দেওয়ার। নইলে ১৯৯৯ সাল থেকে যারা প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি তাদের হঠাৎ গুরু নানকের 'কর্তারপুর করিডোর' নিয়ে এত উৎসাহ কেন? বালাকোট আর কাশ্মীরে ৩৭০ রদের পর উৎসাহটা যেন বেড়ে গেছিল। ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যের 'ডেরা বাবা নানক' গ্রাম থেকে পাকিস্তানের ৪.৭ কিমি ভেতরে দরবার-সাহিব গুরুদোয়ারা আছে। যেখানে গুরু নানক শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ১৮ বছর ছিলেন। ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে সেখানে ভিসা ছাড়াই যাবার ব্যবস্থা হল। কাজটা খারাপ না, উদ্দেশ্যটা খারাপ। করিডোর উদ্বোধনের আগের দিন পাকিস্তান একটা ভিডিও ছাড়ে যাতে ১৯৮৪ সালে 'অপারেশন ব্লু-স্টার'-এ নিহত উগ্রপন্থী জারনাইল সিং ভিন্দ্রানওয়ালের ছবিও ছিল। 'দি প্রিন্ট' তাদের রিপোর্টে বলেছে পাকিস্তান অতীত থেকে শিক্ষা নেয়নি।

পাকিস্তানকে নিয়ে এটাই ভয়। নিজের কাজ ছেড়ে অন্যের ক্ষতি করার অভ্যাসটা মজ্জাগত হয়ে গেছে। তবে আপাতত বিশ্ববাজারে টার্কি, মালয়েশিয়া আর চিন ছাড়া, কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের কোন সমর্থক নেই। টার্কি আর মালয়েশিয়া ইসলামপ্রধান। টার্কি পাকিস্তানের প্রতিবেশী আর সে দেশের রাষ্ট্রপতি এরদোগান আপাতত ইসলাম নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছেন। সুতরাং একটা তাগিদ আছে। কিন্তু এনিয়ে বেশিদূর এগোবে বলে মনে হয় না। একে সেই শক্তি নেই অন্যদিকে টার্কি এখন ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াবার ব্যাপারে খুব মনোযোগী। ভারত ও টার্কির প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা। তার মধ্যে ভারতের রপ্তানি ৫ বিলিয়ন ডলার। রপ্তানির মধ্যে সামরিক সরঞ্জামও আছে। ভারত-মালয়েশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক তো আছেই, তার ওপর মালয়েশিয়ার সঙ্গে চিনের সম্পর্ক সুবিধেজনক নয়। জলসীমা নিয়ে ঝগড়া লেগেই আছে। ভারতকে বেশি চটিয়ে মালয়েশিয়ার লাভ নেই। সব মিলিয়ে, এরা দুজন ফাঁকা আওয়াজ ছেড়েছে বলেই মনে হয়। তাতে দুজনের কিছু ক্ষতিও হয়েছে। ভারত সরকার টার্কিতে সামরিক সরঞ্জাম বিক্রির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ এনেছে।

সমস্যা যদি কিছু থেকে থাকে সেটা চিন-পাকিস্তান সম্পর্ক। দুজনেরই দুজনকে চাই। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদ হবার পর জাতিসংঘ এনিয়ে আলোচনা করতে চায়নি। পরে স্থায়ী সদস্য চিনের চাপে দরজা বন্ধ করে শুধু সুরক্ষা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী ও ১০ অস্থায়ী সদস্যের ভেতর আলোচনা করে। নিয়ম অনুযায়ী এই আলোচনার কোন রকম মান্যতা নেই, কোন লিখিত ধারাবিবরণী রাখা হয় না, কি আলোচনা হল সেটা কাউকে জানানো হয় না। যেহেতু আমেরিকা, রাশিয়া সহ সুরক্ষা পরিষদের বাকি সব স্থায়ী সদস্য আগেই বলে দিয়েছিল যে কাশ্মীর ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়, তাই এনিয়ে তেমন কোন বিপদের আশঙ্কাই ছিল না। তাছাড়া, পরবর্তীতে চিন পরিষ্কার বলে দিয়েছে, কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের যদি কোন বক্তব্য থাকে সেটা ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক স্তরে করতে হবে। এর অর্থ হল, কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান আর মুরুব্বি পাকড়াতে পারবে না। কথায় কথায় জাতিসংঘের ভয় দেখানো বন্ধ।

আসল মুশকিল হল, চিন আর পাকিস্তানের সামরিক সম্পর্ক। চিন সেই ষাটের দশক থেকে পাকিস্তানকে অস্ত্র যোগাচ্ছে। এই মুহূর্তে পাকিস্তান যে অস্ত্র কেনে তার ৬০%-এর ওপর চিনা। এককালে পাকিস্তান আমেরিকার কাছ থেকে

টাকা নিয়ে মার্কিন অস্ত্র কিনত। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যোগাযোগের কারণে আমেরিকা সে টাকার যোগান কমিয়েছে। এবার ভরসা চিন। নিউইয়র্ক টাইমসের, ২০১৮ সালের রিপোর্ট বলছে সিপিইসি-র নামে চিন পাকিস্তানে অস্ত্র তৈরির কারখানা বসাবে। রিপোর্ট যদি সত্যি হয় তাহলে চিন্তার কথা। আরও চিন্তার কথা পাকিস্তান যে চিনের কাছ থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পোর্ট, রাস্তা তৈরির জন্যে ঋণ পাচ্ছে, তার কতটা সন্ত্রাস ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছে? খুব সম্প্রতি কিছু রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তানে দুর্নীতির ঠেলায় অতিষ্ঠ হয়ে চিন টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে সাবধান হয়েছে।

তবে আমার ব্যক্তিগত ধারণা হল, পৃথিবী জোড়া চাপের মুখে পাকিস্তান আর আগের রাস্তায় হাঁটতে পারবে না। চিন তো আর সর্বক্ষেত্রে পাকিস্তানকে বাঁচাতে পারবে না! এফএটিএফ সন্ত্রাসবাদী দেশের তকমা বসিয়ে দিলে তখন সবার দানাপানি বন্ধ। আরও বড় বিষয় হল, ভারত-চিন সম্পর্ক ভবিষ্যতে কোন দিকে যাবে? এটা ঠান্ডা লড়াইয়ের যুগ না। ভারত আর চিনের ভেতর ৭০ থেকে ৮০ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা হয়। চিনের বড় বড় কোম্পানিরা ভারতে টাকা ঢালছে। আমেরিকার মতো চিনও নানা ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যে ইচ্ছুক। পি ভি নরসীমা রাও ভারতে আর্থিক সংস্কার করেছিলেন চিনকে দেখে। মোদীও পরিকাঠামো তৈরিতে চিনের পথ অনুসরণ করছেন। বার বার বলেছেন ভারত ও চিন একসঙ্গে আঞ্চলিক পরিকাঠামো তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে। আমার মনে হয় আগামীতে এই দুই দেশের ভেতর বোঝাপড়া আরও বাড়বে। কিছু প্রতিযোগিতা নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু চিন ভারত ধ্বংসতে মদত দেবে কিংবা ভারত আগ বাড়িয়ে চিনের ক্ষতি করতে চাইবে বলে মনে হয় না। আরও বেশি করে এই কারণে মনে হয় না যে, ভারত এখন জাতিসংঘে স্থায়ী সদস্যপদ পেতে মরিয়া, তাতে বাধা একমাত্র চিন। যুক্তি বলে, ভারত আগামী দিনে চিনকে পাশে পেতে চাইবে।

কাশ্মীরে শান্তি প্রক্রিয়ায় চিন বাধা হবে বলে মনে হয় না। বরং সিপিইসি যদি হতে হয় তাহলে ওই অঞ্চলে সুরক্ষা বাড়া দরকার। পাকিস্তান রোজ কাশ্মীরে জঙ্গি ঢোকাবে, দু-দেশের মিলিটারি গুলি-গোলা ছুঁড়বে আবার একই সঙ্গে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে সেটা অসম্ভব। তাছাড়া সিপিইসি করতে গিয়ে চিন নিজেই পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়েছে। সুতরাং

কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদের রবরবা কমা উচিত। সব মিলিয়ে, আমার ধারণা, কাশ্মীরের অশান্তি এবার কমবে তবে সময় লাগবে— হয়তো বছর পাঁচ কি দশ। অবশ্য এই সময়কালটা ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, অর্থনীতির ওপর খানিকটা নির্ভর করবে। মোদী যদি ক্ষমতায় থাকেন অথবা ভারত যদি একই ভাবে শক্তির নিদর্শন রাখে, তাহলে পরিস্থিতি তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হবে।

পাকিস্তানের কাছেও এটাই সুযোগ দেশটাকে নতুন করে গড়ার। যেমন বাংলাদেশে শেখ হাসিনা করলেন। দশ বছরের শাসনে সন্ত্রাসবাদের গোড়া সুদ্ধ ঝাঁকিয়ে দিয়েছেন। মুশকিল হল, ইমরান খান ক্ষমতায় এসেছেন ধর্মের দোহাই দিয়ে। তাই সন্দেহ থেকেই যায়।